বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি প্রসঙ্গ

শিক্ষকদের রঙিন দলগুলো কতটা রঙ ছড়ায়

আখতার হোসেন আজাদ

| ঢাকা , শুক্রবার, ১৪ জুন ২০১৯

শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষই তার মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে না। শিক্ষিত মানুষ দেশ ও জাতির সম্পদ। যে দেশের মানুষ যত বেশি শিক্ষত, সে দেশের মানুষ তত বেশি উন্নত। শিক্ষা জাতির মেরুদ- বাক্যটি সর্বজনীন স্বীকৃত। আর সেই মেরুদ- গড়ার কারিগর হলেন শিক্ষকরা। আবার বিশ্ববিদ্যালয় হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরুদের দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের কর্ণধার ভাবা হয়। শিক্ষকতা সমাজের মহান পেশাগুলোর মধ্যে অন্যতম। শিক্ষকরা অনেকটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীদের মতো। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে নিঃস্বার্থভাবে যেভাবে অন্যের সেবা প্রদান করে, বিপদের সময় সাহায্যে এগিয়ে আসে তেমনই শিক্ষকরা একইভাবে কোনো প্রকার বিভাজন ছাড়াই সবাইকে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। জাতিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কারিগররা শিক্ষার মান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু

রাখা এবং শিক্ষার্থীদের সব ধরনের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা থাকে অপরিসীম। এতক্ষণ এসব ছিল শাস্ত্রের বা নীতির কথা।

বর্তমানে প্রেক্ষাপট যেন একটু ভিন্নই লক্ষ্য করা যায়। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষকরা বিভিন্ন রঙের দলে বিভক্ত। আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দল, বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দল, প্রগতিশীল ও বাম রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত গোলাপি দলে ভাগ হয়ে শিক্ষকরা পরস্পরের সহযোগী না হয়ে যেন প্রতিপক্ষে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছেন। শিক্ষকতার মূল উদ্দেশ্য হওয়ার কথা ছিল পাঠদান করা, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখভাল করা। কিন্তু এই নীতিবাক্য থেকে যেন উনারা দূরে সরে গিয়েছেন।

শিক্ষক রাজনীতি এসেছে অনেকটা আদর্শ চর্চার জায়গা থেকে। বিভিন্ন ফোরাম গঠন হতো সমমনা আদর্শের শিক্ষকদের নিয়ে। তবে আগেকার দিনে শিক্ষকরা রাজনীতি করতেন গণমানুষের জন্য। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা ছিল অনবদ্য ও অতীব প্রশংসনীয়। তাদের নেতৃত্ব, দিক-নির্দেশনা থেকে তখন ধাপে ধাপে জাতি বিভিন্ন শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেকটাই দলীয় লেজুড়বৃত্তির চর্চা হচ্ছে বলে

সুশীল সমাজের অনেকেই মন্তব্য করে থাকেন। তাদের মধ্যেও রাজনীতির মতো পারসোনাল পারসোন বা মাই ম্যান তৈরির প্রবণতা শুরু হয়েছে। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উচ্চতর পদ থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট-সিনেট-ফিন্যান্স কমিটির সদস্য এবং ডিন নিয়োগ নির্বাচনের মাধ্যমে হয়। এছাড়াও প্রভোস্ট, হাউস টিউটর, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক সমিতি নির্বাচনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন লাভজনক পদের হাতছানি তো রয়েছেই। এজন্যই বোধহয় বিভিন্ন রঙ ধারণ করে শিক্ষকরা রাজনীতির ছাতাতলে আশ্রয় নিতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আবার নবনিযুক্ত সিংহভাগ শিক্ষকের বিভিন্ন প্যানেলে যুক্ত হওয়া দেখে অনুমান করলে তা ভুল হবে না যে তিনি যেন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নেরই দায়িত্ব নিয়েছেন। ক্ষমতা ও বস্তুগত চিন্তা থেকেই নবনিযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষক রাজনীতিতে এক প্রকার বাধ্যই করা হয়। আবার বাসা বরাদ্দ, পদোন্নতি, বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিজের নাম অন্তর্ভুক্তিসহ বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা করেই অনেক শিক্ষক স্বেচ্ছায়ও বিভিন্ন রঙের ফোরামে যোগ দিয়ে থাকেন। তারপর থেকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সেমিনারে তাদের কারও কারও বক্তব্য শুনলে মনে হতেই পারে তিনি যেন কোন রাজনৈতিক দলের নেতা। এই সুযোগ কাজে লাগান দলপতি বা সিনিয়র শিক্ষকরা। নিজের

ফোরামে টানতে সকল কলাকৌশল প্রয়োগ করেন। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে নব-নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ভোটদানের পর ব্যালট পেপারের ছবি তুলে এনে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেখানোর খবর পত্রিকায় প্রকাশ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে শুধু দলে টেনেই নয় বরং তাদের তদারকিতেও রাখা হয়।

বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলাদলি ও রেষারেষি চরম আকার ধারণ করেছে। এমনকি কখনও কখনও দলীয় ফোরামে নিজেদেরই হাতাহাতির ঘটনায় পত্রিকার শিরোনাম হয়েছেন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষা কাঠামো। শুধু রাজনীতি করার জন্য কোনো গবেষণা ছাড়া বা প্রকাশনা ছাড়া এবং শিক্ষকতার নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ না করা সত্ত্বেও পদোন্নতি ঘটেছে এমন খবরও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের ওপর। শিক্ষক রাজনীতির ছোবলে পড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ডিনদের বিদায়ের খবরও আগে দেখা গেছে।

কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম একটি সেমিনারে বলেছিলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নয়, যেন ভোটার নিয়োগ করা হচ্ছে। কথাটি যে অমূলক

নয়, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবরে তা প্রমাণ করে। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরেই মূলত এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মেধার থেকে আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় যেন এখন শিক্ষক নিয়োগে প্রাধান্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় আনুগত্য সম্পন্ন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের নৈতিকতার মাপকাঠিও থাকে অপূর্ণ। এটি যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, এভাবেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে।

আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকদের দেখা যায় কেবলমাত্র সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচিতে নিয়মিত অতিথি হতে দেখা যায়। কিন্তু অনেকেই মন্তব্য করে থাকেন, ছাত্রলীগের অতিথি হলে ছাত্রদলের দোষ কি? আবার আইনিভাবে ছাত্রশিবির যেহেতু এখনও নিষিদ্ধ নয়, সেহেতু শিবির ডাকলে সেখানেও আপনার যাওয়া উচিত। আবার শিক্ষকের মতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মতের অনুসারী বলে অনেক ছাত্রকে পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দেয়া, ফেল করানোর নজিরও আমাদের রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তচিন্তার স্থান। সেখানে বিভিন্ন মতের, আদর্শের রাজনীতি থাকবে এটিই স্বাভাবিক বিষয়। সকল শিক্ষার্থীর মন মানসিকতা এক রকম নয়। একজন শিক্ষক কখনও ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস বা অন্য কিছুর জন্য বৈষম্যে কাউকে ভাগ করতে পারেন না। কে ছাত্রলীগ, কে ছাত্রদল বা কে ছাত্রশিবির কিংবা কে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের রাজনীতি করে তা বড় কথা নয়। ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের কাছে সবাই সমান।

একপেশে আচরণ করা কখনও কাম্য নয়। তবে রাজনীতির নামে কখনও অপরাজনীতি চর্চা করা উচিত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে পড়াশোনা, গবেষণা, সেমিনার, বিতর্ক ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকা- নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত তাদের অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তাই বলে তারা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবেন, দলীয় রাজনৈতিক সভায় নিয়মিত অতিথি হবেন, রাজনৈতিক নেতাদের ঢঙে বক্তব্য দিবেন, এসব মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো আইনে এসব নিষিদ্ধ না থাকলেও এহেন কর্মকা- শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও সম্মান বাড়ায় না, বরং কমে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাকসু নির্বাচন নিয়ে যখন মন্তব্য করলেন যে, এ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধায় আমি বিস্মিত, অভিভূত। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের শিক্ষার্থীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল এমন মন্তব্য শুনে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিন্দার ঝড়।

বর্তমানে অনেক শিক্ষক গবেষণা ও পাঠদানের চেয়ে রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আবার অনেকে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। একজন শিক্ষক যদি কোনো রাজনৈতিক দলের পদধারী হয়ে থাকেন, আবার তিনি যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ আদর্শের ফোরামের নেতৃত্ব দেন তখন প্রশ্ন উঠে তিনি কোন কাজটি

সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন? কখন রাজনীতি করবেন, কখন ফোরাম চালাবেন, কখনই বা পাঠদান আর গবেষণা করবেন? নিয়মিত টকশোতে উপস্থিত হওয়ার কথা না হয় বাদই থাকল। রাজনীতি একটি দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সুদক্ষভাবে পরিচালিত করার জন্য বারবার আমাদের রাজনীতির কাছেই ফিরতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিকে আমরা কলুষিত করে ফেলেছি। আমরা এটিকে এত নোংরা পর্যায়ে নিয়ে গেছি যার নাম শুনলেই নাকে গন্ধ আসে। এমন রাজনীতি চর্চা যখন কোন শিক্ষক করেন, তখন সেটি আরও ভয়াবহ পর্যায়ে রূপ নেয়। তাই এই নষ্ট রাজনীতি থেকে শিক্ষকদের দূরে থাকতে কখনও কখনও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি তোলে স্লোগান ওঠে শিক্ষকদের রাজনীতি নয়, শিক্ষানীতি চর্চা করা উচিত।